International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-XI, Issue-II, March 2025, Page No. 213-218
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v11.i2.020

মহাভারতের প্রেক্ষিতে নৈতিক দ্বন্দ্ব: একটি পর্যালোচনা

চন্দ্রিমা মাইতি
স্বাধীন গবেষক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received 15.03.2025; Accepted: 28.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

From the starting point of Philosophy, two opposite theories are discussed parallelly, just as two parallel lines on a railway track run side by side for an infinite distance; but they never meet. The discussion of contradicting theories like Materialism-Idealism, Rationalism-Empiricism, Monism-Dualism, Consequentialism-Deontology, Egoism-Altruism are the most preferable examples of the philosophical debates. In ethics, as in metaphysics and epistemology, various such contradicting theories are found. But one of the most complicated discussions is between ethical principles and moral dilemmas. Moral dilemmas are an unsolved problem in ethics. Genuine moral dilemmas are like self-contradictions where the universal ethical principles cannot be implemented. Although in Indian epics and literature, some solutions are provided by Indian thinkers, which is the main discussion of this article.

Keyword: *Philosophical debate, Ethical principle, Moral Dilemmas, Self-contradiction, Indian epics, solution.*

দর্শনের যে শাখায় নৈতিকতা, ব্যক্তির আচরণ ও তার ভালোমন্দের বিচার- বিশ্লেষণ করা হয় তাকে নীতিবিদ্যা বলা হয়। দর্শনের সূচনাকাল থেকেই আধিবিদ্যক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি নীতিবিদ্যার আলোচনাও সমানভাবে আলোচিত হয়েছে। পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার আলোচনায় প্রাক-সক্রেটিস পর্বের দার্শনিক হেরাক্লিটাস থেকে স্টোয়িক, সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিষ্টটল এবং আধুনিক যুগের মিল, বেন্থাম, কান্ট প্রমুখ দার্শনিকদের অবদান অনস্বীকার্য। যদিও ভারতীয় দর্শনে পৃথকভাবে নীতিবিদ্যার আলোচনা পাওয়া যায় না। ভারতীয় আস্তিক- নাস্তিক উভয় সম্প্রদায়ের দার্শনিকরা তাঁদের দর্শন চর্চার মধ্যেই তাঁদের নীতিতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। নীতিবিদ্যার আলোচনায় বিভিন্ন নিয়ম-নীতি ও তার সার্বিকতার ধারণা পাওয়া যায়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কোন নীতি পালন করা বাঞ্ছনীয় তার ও সুস্পষ্ট ধারণা দার্শনিকরা দিয়ে থাকেন। কিন্তু সমস্ত পরিস্থিতি একইরকম হয় না তাই কোনও সার্বিক নিয়ম প্রণয়ন করা আদৌ সম্ভব কিনা এই নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। এই মতভেদের অন্যতম একটি কারণ হল "নৈতিক দ্বন্দ্ব" বা 'Moral Dilemma'। নৈতিক দ্বন্দ্বের স্থলে সার্বিক কোনও নিয়ম গ্রহণ করা সবসময় সম্ভব হয় না।

নৈতিক দ্বন্দ্বের সংজ্ঞা ও উদাহরণ:

নৈতিক দ্বন্দ্ব বলতে বোঝানো হয়, যখন কোনও ব্যক্তির কাছে একই সময়ে দুটি নৈতিক কর্তব্য এসে উপস্থিত হয় যে দুটিই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একই সময়ে দুটি নৈতিক দায়িত্ব পালন করা ওই ব্যাক্তির পক্ষে সম্ভব নয়; এমতাবস্থায় তিনি যদি একটি কর্তব্য পালন করেন তবে অপরটি অপালনীয় রয়ে যায়। ফলে ওই ব্যক্তির কোনও কর্তব্য পালন করা উচিত তা নিয়ে তিনি মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন। এরূপ দ্বিধাগ্রস্থ অবস্থাকেই "নৈতিক দ্বন্দ্ব" বলা যেতে পারে। যেমন- ধরা যাক কোনও ব্যক্তি নিজের দুই সন্তানকে নিয়ে নদীতে ঘুরতে গেছেন। কোনও কারণে নৌকোডুবি হওয়ার ফলে এমন এক পরিস্থিতি উপস্থিত হল যে তিনি তাঁর যেকোনো একটি সন্তানকে নিয়ে সাঁতরে পাড়ে পৌঁছতে পারবেন। তাঁর সন্তানরা যেহেতু সাঁতার জানেন না তাই উভয়কে একই সময় বাঁচানো সম্ভব নয়। তিনি যেকোনো একজনেরই প্রাণরক্ষা করতে পারবেন এবং নৌকোয় উপস্থিত অপর কোনও ব্যক্তি তাকে সাহায্য করতে রাজি নন। এই অবস্থায় পিতার যে মানসিক অবস্থা তা নৈতিক দ্বন্দ্বের উদাহরণ। কেননা তিনি তাঁর যে সন্তানকেই বেছে নিন না কেন অপরকে ত্যাগ করতে হবে এবং পরোক্ষভাবে সেই সন্তানের মৃত্যুর জন্য পিতাই দায়ী থাকবেন।

দৈনন্দিন জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই আমরা এমন নৈতিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হই। এমনকি আমাদের দেশের ধ্রুপদী সাহিত্য এবং সমকালীন সাহিত্যে ও এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই নৈতিক দ্বন্দ্বের স্থলগুলি অমীমাংসিত রয়ে যায়। নৈতিক দ্বন্দ্ব হল অনেকটা paradox বা কূটাভাসের মত। যদিও নীতিবিদ্যার আলোচনায় নৈতিক দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব আছে কিনা তা নিয়ে নীতিদার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। অনেকেই মনে করেন নৈতিক দ্বন্দ্ব যুক্তিসঙ্গত নয় তাই সেগুলোর সমাধান সম্ভব কিনা সেই আলোচনা বৃথা। আবার অনেকেই মনে করেন নৈতিক দ্বন্দ্ব আছে এবং তার স্থায়ী সমাধান ও সম্ভব। তৃতীয় একদল নীতিদার্শনিক মনে করেন নৈতিক দ্বন্দ্বের বাস্তবে কোনও সমাধান সম্ভব নয়। সুতরাং নৈতিক দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব বিষয়ে এই তর্ক-বিতর্ক বহু দশক ধরে চলে আসছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। তাই সেই বিষয়টি আলোচনাসাপেক্ষ। বর্তমানে এই প্রবন্ধে মূলত ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতকে অনুসরণ করে কিছু উল্লেখযোগ্য নৈতিক দ্বন্দ্বের স্থল আলোচিত করা হচ্ছে এবং সেই নৈতিক দ্বন্দ্বসমূহের কোনও স্থায়ী সমাধান মহাকাব্যে পাওয়া যায় কিনা সেটিও এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়।

মহাভারতে উল্লেখিত নৈতিক দ্বন্দ্বের ঘটনাসমূহ:

মহাভারত কেবল ভারতীয় মহাকাব্য বা আখ্যান নয়, মহাভারতকে সংহিতা বা পঞ্চম বেদ ও বলা হয়ে থাকে। এটি প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম, রাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির আদর্শ উদাহরণ। বিশ্বের বৃহত্তম সাহিত্যকর্মের একটি অনন্য উদাহরণ হল মহাভারত। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত মহাভারতে ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচয় এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের প্রসঙ্গে বলেন "এটি কোনও ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নয়, এটি একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস"। মহাভারতের মূল আলোচনার বিষয় হল- হস্তিনাপুর রাজ্যের সিংহাসনের জন্য চন্দ্রবংশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব মূলত রাজবংশের দুই পরিবার কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সংঘর্ষ। যার সমাপ্তি ঘটে রক্তক্ষয়ী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। ভারতীয় ধর্ম দার্শনিকরা মহাভারতকে মূলত দ্বাপরযুগের ঘটনা বলে উল্লেখ করেন এবং মহাভারতের সমাপ্তির সময় হতে কলিযুগের সূচনা বলে উল্লেখ করা হয়। বর্তমানে ভারতীয় মহাকাব্যকে অনুসরণ করে নৈতিক দ্বন্দ্বের আলোচনা নিম্নে উল্লেখিত করা হল-

(ক) মহাভারতে নৈতিক দ্বন্দ্বের একটি অন্যতম উদাহরণ পাওয়া যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সূচনাকালে। যার উল্লেখ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায় **'বিষাদ যোগ'**-এ পাওয়া যায়। যুদ্ধের প্রথম দিনে যখন কৌরব এবং পাণ্ডব উভয়েই কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে এসে উপস্থিত হন তখন উভয় পক্ষে নিজেদের আত্মীয়-পরিজনের উপস্থিতি দেখে অর্জুন দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তিনি তাই শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন যে যুদ্ধ সূচনার পূর্বে তিনি একবার উভয় পক্ষের

সেনাদলকে দেখতে চান। কৃষ্ণ অর্জুনের কথামতো রথ দুপক্ষের সেনার মাঝে নিয়ে যাওয়ার পর অর্জুন উভয় পক্ষের সেনাদলের মধ্যে নিজের পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, শ্বশুর, মিত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিতি দেখতে পান। সকলকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখে অর্জুন শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে রাজ্যলাভের আশায় তারা যুদ্ধে এসেছেন সেই রাজ্য লাভ করে কি হবে যদি না তাঁর আত্মীয়রাই জীবিত থাকেন? যুদ্ধে তাকে নিজ স্বজনদের হত্যা করতে হবে। তাই নিজের হাতে নিজের বংশ ধ্বংস করা অপেক্ষা যুদ্ধ না করাই শ্রেয় বলে তিনি মনে করেন। অর্জুনের এই দ্বিধাগ্রস্থ অবস্থা লক্ষ করে কৃষ্ণ অর্জুনের উদ্দেশ্যে বলেন একজন ক্ষত্রিয়ের কাছে ক্ষাত্রধর্ম পালন করাই সর্বাপেক্ষা শ্রেয় এবং ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হল যুদ্ধ করা। এইপ্রসঙ্গে তিনি বলেন-

> "শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
> স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।"

স্বধর্মের অনুষ্ঠান যদি দোষযুক্তও হয় তবুও তা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মের থেকে উৎকৃষ্ট। স্বধর্ম সাধনে যদি মৃত্যু হয়, তবে তা মঙ্গলজনক কিন্তু অন্যের ধর্ম অনুষ্ঠান করা বিপদজনক। তাই অর্জুন যদি নিজের স্বধর্ম পালন না করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন তবে তাতে তাঁর ক্ষত্রিয়ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়। এই পরিস্থিতিতে অর্জুনের মনে নৈতিক দ্বন্দ্ব দেখা যায় কারণ যদি তিনি যুদ্ধ করেন তবে তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁর হাতেই নিহত হবেন। আর যদি তিনি যুদ্ধ না করেন তবে তাঁর ক্ষত্রিয়ধর্মের মর্যাদাহানি হয়। অর্জুনের মনোভাব অনুধাবন করে কৃষ্ণ তাকে পুনরায় উপদেশ দেন-

> "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
> মা করমফলহের্তুভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি।।"

অর্থাৎ ফলাফল না ভেবে নিরাসক্তভাবে যুদ্ধ করাই অর্জুনের কর্তব্য। স্বধর্ম বিহিত কর্মে অর্জুনের অধিকার আছে কিন্তু কোনও কর্মফলে তাঁর অধিকার নেই। তাই ফলের চিন্তা ত্যাগ করে কর্তব্যের খাতিরেই কর্তব্য করা উচিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যেহেতু ধর্মযুদ্ধ তাই তাতে অংশগ্রহণ করা সমস্ত ক্ষত্রিয়ের কাছে সম্মানের। তাই অর্জুন যদি রাজ্যলাভের কামনা-বাসনা ত্যাগ করে কেবলমাত্র নিজের স্বধর্মপালনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেন তবে তাতে কোনরূপ অন্যায়-আচরণ হয় না। কৃষ্ণের কথায় পরবর্তীকালে অর্জুন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে রাজি হন।

(খ) অপর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় **মহাভারতের কর্ণপর্বে**। কর্ণপর্বে দেখা যায়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সপ্তদশ দিনে যুধিষ্ঠির সম্মুখসমরে অঙ্গরাজ কর্ণের কাছে হেরে যান এবং আহত হয়ে শিবিরে পালিয়ে আসেন। কর্ণ যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে সকলের সম্মুখে অপমানমূলক বাক্যপ্রয়োগ করেন। সেইসময় যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা অর্জুনও তাকে রক্ষা করতে পারেননি। সন্ধ্যায় যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর শিবিরে ফিরে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের সাথে দেখা করতে গেলে ক্ষুব্ধ যুধিষ্ঠির ক্রোধের বশে অর্জুনকে অপমান করেন। তিনি বলেন, অর্জুন যে নিজেকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর মনে করেন তা আদপে মিথ্যা। এরপর তিনি অর্জুনের গাণ্ডীব ধনুকের ও অপমান করেন। এই গাণ্ডীব ধনুক অর্জুন অগ্নিদেবতার কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন এবং তিনি নিজেকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ব্যক্তি তাঁর গাণ্ডীবের অপমান করবেন তিনি তাঁর শিরচ্ছেদ করবেন। ফলতঃ, যুধিষ্ঠির গাণ্ডীবের অপমান করায় অর্জুনের মনে নৈতিক দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হয়। কারণ তিনি যদি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে চান তবে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করতে হবে আর যদি তিনি যুধিষ্ঠিরকে বাঁচাতে চান তাহলে তাঁর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে। এসময় কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হন এবং অর্জুনকে নৈতিক সংকটে ভুগতে দেখে তিনি বলেন, শিক্ষিত জ্ঞানী লোক কখনও নিদারুণ কর্ম করেও মহৎ পুণ্যের অধিকারী হন আবার কখনও অল্পজ্ঞানী ব্যক্তি সত্যের পথ অনুসরণ করেও পাপগ্রস্থ হন। তিনি এসময় অর্জুনকে দুটি গল্প শোনান। প্রথম দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি ব্যাধ বলাকের উদাহরণ দেন। বলাক ব্যাধ হলেও তিনি কখনও বিনা কারণে পশুহত্যা করতেন না। কেবল নিজের জীবিকানির্বাহের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই পশু হত্যা করতেন। একদিন তিনি বনে গিয়ে কোনও পশু শিকার করতে পারলেন না, তখন দূরের এক জলাশয়ের পাশে বসে থাকার সময় এক অন্ধ শ্বাপদকে জলপান করতে দেখলেন। বলাক সেই অদৃষ্টপূর্ব শ্বাপদকে বধ করতেই দেবতারা বলাককে রথে চাপিয়ে স্বর্গে নিয়ে যান।

কেননা সেই শ্বাপদ সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট করে দেন যার কারণে ব্রহ্মা তাকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। বলাক সেই সর্বপ্রাণীহিংসক শ্বাপদকে বধ করার ফলে বলাকের স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। দ্বিতীয় গল্পটি শোনান কৌশিক নামের একজন ঋষির। কৌশিক নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ গ্রামের থেকে অল্পদূরে নদীর সঙ্গমস্থলে বাস করতেন। তিনি তপস্বী হলেও অল্পজ্ঞ ছিলেন। তাঁর ব্রত ছিল তিনি সর্বদাই সত্য কথা বলবেন তাই তাকে সত্যবাদী বলা হতো। একদিন কয়েকজন লোক দস্যুর থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে কৌশিকের তপোবনে আশ্রয় নেয়। কিছু সময় পরে দস্যুগণ সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং কৌশিক কিছু লোককে এদিকে আসতে দেখেছেন কিনা তা জানতে চান। কৌশিক বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-সমাকীর্ণ একটি স্থান দেখিয়ে বলেন তারা ওই স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। নিষ্ঠুর দস্যুরা তখন সেই লোকদের খুঁজে বের করে তাঁদের হত্যা করেন। ঋষি কৌশিক ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানতেন না তাই তিনি পাপগ্রস্থ হয়ে মৃত্যুর পর নরকে যান। এই গল্প শুনিয়ে কৃষ্ণ অর্জুনের উদ্দেশ্যে বলেন-

"অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্ ব্যাপকূজতঃ।
শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং তৎ সত্যমবিচারিতম্।।"

অর্থাৎ যেখানে কিছু বলা আবশ্যক, না বলা শঙ্কাজনক সেখানে মিথ্যাই বলা শ্রেয়। সে মিথ্যাকে নির্বিচারে সত্য বলে স্বীকার করা যেতে পারে। কৌশিক যদি নরহত্যা রোধ করতে মিথ্যা বলতেন তবে তাঁর নরকবাস হত না অথবা যদি তিনি তাঁদের আশ্রয় নেওয়ার সময় বলে দিতেন যেহেতু তিনি মিথ্যা বলেন না তাই ওই আগন্তুকদের অন্য কোনও স্থানে আশ্রয় নেওয়া উচিত তবে তাঁর পাপ হত না। পরবর্তী সময়ে তারা দস্যুর হাতে ধরা পরলেও তাতে কৌশিকের পাপ হত না। কৃষ্ণের কথা শ্রবন করে অর্জুন কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এমন কোনও উপায় দিতে যাতে তাঁর সত্যরক্ষা ও হয় আবার যুধিষ্ঠির ও জীবিত থাকেন।

কৃষ্ণ এই সমস্যার সমাধান করতে বলেন যেহেতু গাণ্ডীবের অপমান করা ব্যক্তিকে হত্যা করাই অর্জুনের প্রতিজ্ঞা তাই তিনি এমন উপায় দেবেন যাতে যুধিষ্ঠির জীবিত থেকেও মৃত হন। মাননীয় ব্যক্তি সকলের সম্মানের পাত্র। তাকে যদি কেউ অপমান করেন তখন তাকে জীবন্মৃত বলা যায়। যুধিষ্ঠির এতদিন তাঁর অনুজ ভ্রাতাদের কাছ থেকে সম্মান পেয়ে এসেছেন তাই অর্জুন যদি তাকে অপমান করেন তাহলেই তা যুধিষ্ঠিরের কাছে মৃত্যুর সমান। তাই তিনি অর্জুনকে উপদেশ দেন যুধিষ্ঠিরকে অপমান করতে এতে তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও হবে আবার যুধিষ্ঠির জীবিত ও থাকবেন।

(গ) নৈতিক দ্বন্দ্বের একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় **মহাভারতের দ্রোণপর্বে।** এই পর্বে দেখা যায়, মহারথী দ্রোণ তার সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে কৌরবদের হয়ে যুদ্ধ করছিলেন। যার ফলে পাণ্ডব পক্ষের বহু সেনা হত হয়। দ্রোণকে নিরস্ত করার জন্য সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ মহাবলশালী ভীমকে একটি উপায় বলেন। ভীম শ্রীকৃষ্ণের কথামত বিরাট রাজার অশ্বত্থামা নামক একটি হাতিকে হত্যা করে। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন দ্রোণ যদি তার পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ পান তবে তিনি অস্ত্রত্যাগ করবেন এবং সেই সময় তাকে বধ করা সহজ হবে। কিন্তু অশ্বত্থামার কাছে দেবতাদের বরদান থাকার কারণে তাকে হত্যা করা সহজ নয়। তাই কৌশলে তিনি অশ্বত্থামা নামক একটি হাতিকে হত্যা করার পরামর্শ দেন এবং দ্রোণের সম্মুখে গিয়ে বলেন যুদ্ধে অশ্বত্থামা নিহত হয়েছেন। কিন্তু দ্রোণ কৃষ্ণের কথা বিশ্বাস করতে চাননি। তিনি জানতেন যুদ্ধে জয়ের জন্য কৃষ্ণ কখনও কখনও মিথ্যাও বলে থাকেন। তাই কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দেন যাতে যুধিষ্ঠির এই সংবাদ দ্রোণের কাছে পৌঁছে দেন। সদা সত্য বচন পালনের জন্য যুধিষ্ঠির সকলের প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলতেন না এটি সবাই জানতেন। তাই যুধিষ্ঠির যদি দ্রোণকে অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথা জানান তবে তা তিনি বিশ্বাস করবেন। কৃষ্ণের মুখে অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দ্রোণ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে অশ্বত্থামার বিষয়ে জানতে চান। দ্রোণ জানতেন ত্রিলোকের ঐশ্বর্যের জন্য যুধিষ্ঠির কখনোই মিথ্যা বলবেন না। কিন্তু কৃষ্ণের প্ররোচনায় ও জয়লাভের জন্য যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কথায় রাজি হয়ে যান। অসত্যভাষণ বলার জন্য যুধিষ্ঠিরের মনে ভয় থাকলেও তিনি জানতেন দ্রোণকে বধ না করলে যুদ্ধে জয় পাওয়া

সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে যুধিষ্ঠিরের মনে নৈতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। একদিকে যেমন নিজের সত্য পালন করা তার কর্তব্য তেমনই কৌরবদের মতো অধর্মীদের বিনাশ করে প্রজাদের মঙ্গল করাও রাজার কর্তব্য। অনেক ভাবনা চিন্তা করার পর যুধিষ্ঠির এই দ্বন্দ্ব সমাধান করতে উচ্চস্বরে বলে ওঠেন - 'অশ্বত্থামা হত'। তারপর নিচুস্বরে বলে ওঠেন - 'ইতি কুঞ্জর'(অর্থাৎ হস্তী)। এতে তিনি যেমন সত্য বচনের ও পালন করলেন তেমনই দ্রোণকে বধ করার পথ ও প্রশস্ত করলেন। যার ফলে পরবর্তী সময়ে পাণ্ডবরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন।

(ঘ) নৈতিক দ্বন্দ্বের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় মহাভারতের সভাপর্বে। মহাভারতের সভাপর্বে দেখা যায় হস্তিনাপুরের রাজসভায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের উদ্যোগে একটি দ্যূতসভার আয়োজন করা হয় যেখানে গান্ধাররাজ শকুনি ও কুরুরাজকুমার দুর্যোধন সম্রাট যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলার জন্য আমন্ত্রণ করেন। সেই পাশাখেলায় যুধিষ্ঠির একে একে নিজের সকল সম্পত্তি, নিজের সাম্রাজ্য, অনুজ ভ্রাতাসকলকে বাজি ধরেন এবং হেরে যান। এরপর শকুনির প্ররোচনায় যুধিষ্ঠির নিজেকে পণ হিসাবে রাখেন এবং হেরে যান। সমস্ত কিছু হেরে যাওয়ার পর যুধিষ্ঠির সভা ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে শকুনি যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে বলেন- " রাজা যদি কিছু ধন অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও নিজেকে পণ রেখে হেরে যান তবে পাপ হয়। যেহেতু পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী দ্রৌপদীকে তিনি এখনও পণ ধরেননি তাই দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠিরের পণ ধরা উচিত"। এরপর যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখেন এবং তাকেও পাশাখেলায় হেরে যান। দ্রৌপদীকে হেরে যাওয়ার পর দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন যখন বিক্ষিপ্তকেশ ও অর্ধস্খলিতবসনে আবৃত দ্রৌপদীকে বস্তুর ন্যায় টানতে টানতে কুরু রাজসভায় নিয়ে আসেন তখন অপমানিত ও শোকে বিহ্বল দ্রৌপদী কুরু রাজসভার সদস্যদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন হস্তিনাপুরের কুলবধূ তিনি; তাকে কিভাবে কৌরবগণ এইভাবে সভায় এনে তাঁর মর্যাদালঙ্ঘন করতে পারেন এবং কুরুবৃদ্ধগণ তা নীরবে দেখতে পারেন। এরপর তিনি নিজের স্বামী ও অন্যান্য বিদ্বজ্জনের কাছে প্রশ্ন রাখেন, যুধিষ্ঠির প্রথমে নিজেকে বাজি ধরে হেরে গিয়েছিলেন। তাই যদি হয় তবে তিনি কিভাবে দ্রৌপদীকে পরে বাজি ধরলেন? দ্রৌপদীর এই প্রশ্নের উত্তরে সভার সকল ব্যক্তি নীরব থাকেন কারণ তারা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম ছিলেন। কেবল দুর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণ বলেছিলেন দ্রৌপদীকে বাজি রাখা যুধিষ্ঠিরের অন্যায় হয়েছে। কিন্তু বাকি সকলেই কোনও যথাযথ উত্তর দিতে পারেননি কেননা তারা এই পরিস্থিতিতে নৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন। তৎকালীন সমাজে স্ত্রীকে স্বাধীন বলে মনে করা হতো না। সেই সময়ের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রীরা হতেন স্বামীর সম্পত্তি। তাই তাঁদের যেকোনো খেলায় বাজি হিসাবেও ধরা যেত। মনুসংহিতাতেও এই ধরনের ধারণা দেখা যায় যেখানে স্ত্রীকে স্বামীর অন্যান্য ধন সম্পত্তির সাথেই তুলনা করা হয়ে থাকে। এইস্থলে দ্রৌপদীর প্রশ্নের তাই গভীর তাৎপর্য রয়েছে এবং যদি তাঁর এই প্রশ্নের সঠিক সমাধান দেওয়া হতো তবে তা ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় একটি "দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন" হিসাবে চিহ্নিত হতো। কিন্তু এইক্ষেত্রে নৈতিক দ্বন্দ্বের কোনও সমাধান দেওয়া সম্ভব হয়নি।

নৈতিক দ্বন্দ্ব ও তার প্রকারভেদ:

নৈতিক দ্বন্দ্ব সাধারণত দু-প্রকারের হতে পারে- জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব (Epistemic Conflict) ও আধিবিদ্যক দ্বন্দ্ব (Ontological Conflict)। জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে অনেক দার্শনিকই খাঁটি নৈতিক দ্বন্দ্ব বলেন না। কেননা এইধরনের দ্বন্দ্ব স্থলে কর্তার কাছে যে দুটি নৈতিক কর্তব্য এসে উপস্থিত তা সমান গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং কর্তার স্বল্পজ্ঞান ও বোঝার ভুলের জন্য দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হয়। "বিষাদ যোগে" কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুনের মনে যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তা জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব। নিজ ধর্ম বিষয়ে, কর্তব্য বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারনে অর্জুনের মনে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। তাই কৃষ্ণ অর্জুনের মনের দ্বন্দ্বের সমাধান সহজেই দিতে সম্ভব হন।

কিন্তু আধিবিদ্যক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে এরূপ কোনও সমাধান প্রদান করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে কর্তার কাছে এমন দুটি নৈতিক কর্তব্য এসে উপস্থিত হয় যে দুটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি কর্তব্য পালন করলে অপর কর্তব্য অ-পালনীয় রয়ে যায়। তাই অনেক দার্শনিক এইধরনের নৈতিক দ্বন্দ্বকে 'genuine moral dilemma' বলে স্বীকার

করেন। আধিবিদ্যক দ্বন্দ্বকে আবার অপর দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নৈতিক দ্বন্দ্ব কর্তা স্বয়ং সৃষ্টি করেন বা কর্তার ভুলের কারণেই একই সময়ে দুই ভিন্ন নৈতিক কর্তব্য এসে উপস্থিত হয়। এই ধরণের নৈতিক দ্বন্দ্বকে 'নিজ সৃষ্ট নৈতিক দ্বন্দ্ব' বলে অভিহিত করা হয়। অপরদিকে, অন্য কোনও ব্যক্তি বা বাহ্য কোনও কারণে যদি কর্তার কাছে এমন দুটি নৈতিক কর্তব্য এসে উপস্থিত হয় যার উভয়কে পালন করা কর্তার পক্ষে সম্ভব নয় তবে তা 'বাহ্য সৃষ্ট নৈতিক দ্বন্দ্ব' বলা হয়।

উপসংহার:

মিল, কান্ট প্রমুখ পাশ্চাত্য নীতিদার্শনিকরা মনে করতেন নৈতিক দ্বন্দ্ব বলতে বাস্তবে কিছুই নেই। কেননা নৈতিক দ্বন্দ্বকে স্বীকার করলে বলতে হয় কোনও এক বিশেষ পরিস্থিতিতে নৈতিক নীতিগুলি সমাধানের সূত্র যেমন দিতে ব্যর্থ তেমনি দুটি নৈতিক নিয়মের মধ্যে কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা জানার জন্য ও কোনও সার্বিক নিয়ম নেই। তাই কান্ট মনে করতেন যেকোনো পরিস্থিতিতেই একটি সার্বিক নিয়মই পালন করা উচিত। যেমন- যেকোনো পরিস্থিতিতে সত্য কথাই বলা বাঞ্ছনীয়। আবার কোনও দার্শনিক মনে করেন নৈতিক দ্বন্দ্ব বাস্তবেই আছে এবং তার জন্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে সেই সকল দ্বন্দ্বের সমাধান করা উচিত। কেননা সত্য কথা বলতে গিয়ে যদি কৌশিকের মত অনেক ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হতে হয় তবে সেখানে মিথ্যা বলেই শ্রেয়। নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে গিয়ে বহু মানুষের প্রাণ সংকটে ফেলে দেওয়া উচিত কর্তব্য হতে পারে না। সেই কারণেই কৌশিকের দ্বারা কৃত কর্মটি যৌক্তিক বলে কৃষ্ণ মনে করেননি। প্রখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল কান্ট বা কৃষ্ণ উভয়ের কাউকেই সমর্থন করেননি। তিনি মহাভারতে উল্লিখিত ঋষি কৌশিকের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছেন, দস্যুদের কাছে কৌশিকের মিথ্যে বলতে হতো না তাতে তার সত্যপালনের ব্রত ক্ষুণ্ণ হত। তার বলা উচিত ছিল- 'আমি জানি আগন্তুক ব্যক্তিরা কোথায় আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু আমি তা বলবো না'। এতে তার সত্য পালন ও হতো আবার দস্যুদের হাত থেকে নিরপরাধ ব্যক্তিদের রক্ষা করাও হত। সমকালীন দুজন ভারতীয় দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাদের দর্শনে নৈতিক দ্বন্দ্বের আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের মতোই মনে করতেন, ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যে কথা বলে যদি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা যায় তবে মিথ্যে বলা যেতে পারে। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কান্টের মতো সার্বিক নিয়মকে অনুসরণ করে নৈতিক দ্বন্দ্বের সমাধান করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাই বলেছেন-**' কোনোখানেই মিথ্যা সত্য হয় না, শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না.'**

তথ্যসূত্র:

১) বসু, রাজশেখর,(১৪১৮), কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত, কলকাতা, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ।
২) দাস, কাশীরাম,(১৩৩২ সন),সচিত্র কাশীদাসী অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত, কলকাতা, অক্ষয় প্রেস।
৩) Matilal, Bimal Krishna,(1992), Moral Dilemmas in the MAHÄBHÄRATA, Varanasi: Motilal Banarsidass.
৪) Sharma, I.C.,(1965), Ethical Philosophies Of India, Nebraska: Johnsen Publishing Co.
৫) বাগচী, দীপক কুমার, (২০২১), ভারতীয় নীতিবিদ্যা, কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক।
৬) স্বামী প্রভুপাদ, (১৯৯২), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ, ভক্তিবেদান্ত নদীয়া, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস।